৬

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

ভূমিকা

যুক্তরাজ্যের মত বর্তমান বিশ্বের অন্য আর একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা হ্রাস পেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্রবিশ্বে কর্তৃত্বকারী প্রধান দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্য আমেরিকার অধিবাসীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করে অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সংবিধানের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অন্যতম। গণসার্বভৌমিকতার স্বীকৃতি এবং 'সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন' বলে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে মার্কিন সংবিধান তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছে।

আলোচ্য ইউনিটে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১ ঃ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।*
- *পাঠ-২ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে তুলনা।*
- *পাঠ-৩ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আইন সভার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা।*
- *পাঠ-৪ ঃ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার তুলনা।*

পাঠ-১ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

উদ্দেশ্যঃ

এ পাঠ শেষে আপনি—

◆ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উভয় রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ রয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলেও এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। নিম্নে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলঃ

সরকার ব্যবস্থা ঃ

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান পার্থক্য হলো তাদের সরকার ব্যবস্থার ভিন্নতা। ব্রিটেনে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা (Parliamentary form of Government) প্রচলিত এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা (Presidential form of Government) প্রচলিত। দুই শাসন ব্যবস্থার অধিকাংশ পার্থক্য মূলতঃ সরকার ব্যবস্থা জনিত ভিন্নতা হতে উদ্ভুত।

সংবিধান ঃ

ব্রিটেনের সংবিধান মূলতঃ অলিখিত এবং সুপরিবর্তনীয়। এটি মূলতঃ প্রথা, আচার, ঐতিহ্য এবং অংশত লিখিত দলিল হতে উদ্ভুত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত এবং তা দুষ্পরিবর্তনীয়।

ব্রিটেনের সংবিধান মূলতঃ অলিখিত এবং সুপরিবর্তনীয় কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত এবং তা দুষ্পরিবর্তনীয়।

রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান ঃ

ব্রিটেনে রাজা হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান । তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আমৃত্যু সপদে বহাল থাকেন। তিনি ব্রিটেনের রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান নন। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান।

দায়িত্বশীলতা ঃ

ব্রিটেনে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। কাজেই এ সরকার দায়িত্বশীল সরকার। এখানে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকে। আইন সভার আস্থার উপর নির্ভর করে শাসন বিভাগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। আইন সভার আস্থা হারালে মন্ত্রীগণকে যৌথভাবে পদত্যাগ করতে হয়। একে "মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা" (Ministerial Responsibility) বলা হয়। অপর পক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। রাষ্ট্রপতি এখানে দেশের প্রকৃত শাসন কর্তা। তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্যগণ আইন সভার সদস্য নন এবং তাঁদের কাজের জন্য তাঁরা আইন সভার নিকট দায়ী নন। রাষ্ট্রপতির মর্জির উপর তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁর কাছেই তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়। আইন সভার নিকট মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতার অস্তিত্ব এখানে নাই।

ক্ষমতার বন্টন ঃ

ক্ষমতা বন্টন নীতির উপর ভিত্তি করে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের সরকার ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা বহুকেন্দ্রিক। ব্রিটেনে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার অংগ রাষ্ট্রের সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ঃ

ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অতটা কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয় না। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। এখানে সাংবিধানিক উপায়ে স্পষ্ট ভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই সরকারের অংগগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শুধু তাই নয় সরকারের বিভাগগুলোকে স্বেচ্ছাচারিতার হাত হতে মুক্ত করার জন্য এখানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি (Cheeks and balance system) প্রচলিত আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক আর বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক।

আইন সভা ঃ

উভয় দেশের আইন সভাই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষ। ব্রিটেনে আইন সভার উচ্চ কক্ষ (Upper House) হচ্ছে হাউজ অব লর্ডস্ (The House of Loards)। এটি বৃহৎ তবে তুলনামূলকভাবে ক্ষমতাহীন কক্ষ। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার (কংগ্রেসে) উচ্চ কক্ষের নাম সিনেট (The Senate)। এটি আয়তনে ক্ষুদ্র, তবে অত্যন্ত্র ক্ষমতাধর। বলা হয় "The US Senate is the most powerful second chamber in The World" সিনেট সদস্যরা জনপ্রতিনিধি কিন্তু লর্ডস্ সভার সদস্যরা মনোনয়নের মাধ্যমে আসেন। সিনেটের মোট সদস্য ১০০ এবং যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি এর সভাপতি। তিনি ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা রাখেন। পক্ষান্তরে, লর্ডস্ সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১,০০০ এর বেশী। লর্ডস্ সভার সভাপতিকে 'লর্ড চ্যান্সেলর' (Loard Chancelor) বলা হয়। তিনি ভোট প্রয়োগ করতে পারেন না।

নিম্নকক্ষঃ

ব্রিটেনে আইন সভার নিম্ন কক্ষের নাম 'কমন্স সভা' (House of Commons) । এর সদস্য সংখ্যা ৬৩০ এবং তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ব্রিটেনের প্রমানমন্ত্রী কমন্স সভার নেতা এবং তিনি সহ তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাঁদের কার্যাবলীর জন্য কমন্স সভার নিকট দায়বদ্ধ। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষের নাম 'প্রতিনিধি সভা' (House of Representatives) । এর সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ এবং তাঁরা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কমন্স সভার স্পীকার প্রতিনিধি সভার স্পীকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান। কমন্স সভার স্পীকার পুরোপুরি দল নিরপেক্ষ (Non-partisian)। পক্ষান্তরে প্রতিনিধি সভার স্পীকার দলীয় প্রভাবে প্রভাবিত হন।

আইন প্রণয়ন ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে বিলগুলো বেসরকারী সদস্য 'Private Members' কর্তৃক কংগ্রেসে উত্থাপিত হয় এবং বিল পাশের ব্যাপারে তাঁরা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। কিন্তু, ব্রিটেনে মন্ত্রীগণ কর্তৃক বিলগুলো আইন সভায় উত্থাপিত হয় এবং তা পাশের ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত থাকেন। ব্রিটেনে বিলগুলোর খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর তা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়, আর যুক্তরাষ্ট্রের বিলের উপর কোন সাধারণ আলোচনার পূর্বেই তা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে যে কোন বিল আইনে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন। কিন্তু ব্রিটেনে রাজা বা রানীর সম্মতির ক্ষেত্রে এটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিলের উপর কোন সাধারণ আলোচনার পূর্বেই তা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

বিচার বিভাগ ঃ

বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এখানে বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক (Guardian of the Constitution) হিসেবে বিবেচিত। সরকারের সকল বিভাগের উপরই এর প্রভাব ও প্রাধান্য সুস্পষ্ট। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার (Judicial Review) কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে, 'সংসদীয় সার্বভৌমত্ব' (Parliamentary Sovereignty) ব্রিটেনের সংবিধানের মূল ধারা। এখানে আইন প্রণয়ন কিংবা তা বাতিলের একচ্ছত্র ক্ষমতা আইন সভার। এমন কি আইন সভা আদালতের সিদ্ধান্তকেও বাতিল করে দিতে পারে।

রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা ঃ

ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশেই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার (Bi-party system) সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বিদ্যমান। কোন দেশের সংবিধানেই দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। উভয় দেশেই রাজনৈতিক দলগুলো শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দলীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের দিক দিয়ে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তরাষ্ট্রের দলগুলোর তুলনায় অনেক বেশী সংগঠিত ও সুশৃংখল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্দলীয় ভোটার সংখ্যা মোট ভোটারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু ব্রিটেনে নির্দলীয় ভোটারের সন্ধান পাওয়া দুরূহ।

সারকথাঃ

বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উভয় রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ রয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলেও এদের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. Electoral College এর মাধ্যমে কে নির্বাচিত হন ?
   ক. যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী;
   খ. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট;
   গ. ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট;
   ঘ. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি।

২. দায়িত্বশীল সরকার বলা হয় -
   ক. সংসদীয় সরকারকে;
   খ. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে;
   গ. কংগ্রেসকে;
   ঘ. সিনেটকে।

৩. সিনেটের সদস্য সংখ্যা কত ?
   ক. ২০০;
   খ. ১০৪;
   গ. ১০৩;
   ঘ. ১০০।

উত্তরমালাঃ ১, খ ২, গ ৩. ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মূল পার্থক্যগুলো কি ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-২ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ও ক্ষমতার তুলনা।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদের সদস্য নন।

উদ্দেশ্যঃ

এ পাঠ শেষে আপনি—

◆ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

সাম্প্রতিক কালের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের দুই দিক পাল হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। উভয়েই দু'টি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্ণধার। এদিক থেকে দেখতে গেলে উভয়েই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র ও সরকারের কর্ণধার হিসেবে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

নির্বাচনগত দিক দিয়ে ঃ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভোটদাতাগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দুটো নির্বাচনের ফলের উপর নির্ভর করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে কমন্স সভার সদস্য হিসেবে থাকেন। পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হলে রাজা বা রানী কর্তৃক তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং কার্যতঃ উভয়েই পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন ও উভয়ের নিয়োগ দু'টো নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। অবশ্য নির্বাচন পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক।

লিখিত ও অলিখিত ক্ষমতা ঃ

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পদ শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন লিখিত সংবিধান থেকে, এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস প্রণীত আইন-কানুন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত থেকে।

শাসনতন্ত্র প্রদত্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

অপরপক্ষে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রধানতঃ প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

প্রকৃত ক্ষমতাধারী এবং নামসর্বস্ব ক্ষমতাধারী ঃ

আমেরিকায় ব্রিটেনের রাজার মত কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান না থাকায় রাষ্ট্রপতি আইনতঃ ও কার্যতঃ শাসন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। শুধুমাত্র প্রকৃত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলোতেও তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। অর্থাৎ তিনি একাধারে রাষ্ট্রপতি ও অন্যদিকে সরকার প্রধান।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগকারী হলেও আইনতঃ রাজাই হলেন রাষ্ট্রের প্রধান কর্মসচীব। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে রাজাই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। অর্থাৎ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র সরকার প্রধান।

আইন সভার ক্ষমতা প্রসঙ্গ ঃ

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদের সদস্য নন। অনেকটা আইন সভার প্রভাবমুক্ত এবং আইনসভাও অনুরূপভাবে শাসন কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে আইন সভার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারেও তার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। কি সাধারণ আইন প্রণয়নে, কি অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভাকে তাঁর স্বমতে আনতে বাধ্য করতে পারেন না।

ব্রিটেনে প্রমানমন্ত্রী হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং দলের নেতা হিসাবে তিনি পার্লামেন্ট সভাকে পরিচালিত করে থাকেন। সাধারণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রীপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রী যে নীতি অবলম্বন করেন সাধারণতঃ কমন্স সভা তা অনুমোদন করে। কমন্স সভা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুসৃত নীতি সমর্থন না করলে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভেঙ্গে দেয়ার ভীতি প্রদর্শন করে কমন্স সভাকে সমতে আনতে পারেন।

কার্যকাল ঃ

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত। চার বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ্‌মেন্ট (Impeachment) ব্যতীত অপসারণ কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছরের জন্য কমন্স সভার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পার্লামেন্ট সভার সাথে মত বিরোধ ঘটলে তার পদত্যাগ করার কারণ ঘটতে পারে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদা একদিকে যেরূপ পার্লামেন্ট সভার সাথে যথাসম্ভব মতৈক্য বজায় রাখতে হয়। অন্যদিকে তেমনি জনমত পরিবর্তনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এ দিক থেকে দেখতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাঁকে আইন সভা বা জনমতের উপর এতটা নির্ভর করতে হয় না।

নিশ্চয়তা ঃ

পদত্যাগ, মৃত্যু বা অপসারণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অনুপস্থিত হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং শাসন ব্যবস্থায় তেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় না।

অপরদিকে ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সমগ্র ক্যাবিনেটের পতন ঘটে এবং নতুন করে নির্বাচন ও ক্যাবিনেট গঠনের প্রয়োজন হয়।

শাসন ক্ষমতা ঃ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একাধারে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি বৈদেশিকনীতি নির্ধারণ করেন এবং রাষ্ট্রদূতগণকে নিয়োগ দান করে। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি স্থাপন করতে পারেন ও চুক্তিবদ্ধ হয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নীতি নির্ধারণে প্রয়াসী হতে পারেন। অবশ্য এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগের সময় তাঁকে সিনেটের অনুমোদন লাভ করতে হয়।

কিন্তু ব্রিটেনে এ সকল কাজ আইনতঃ রাজা বা রানীর নামে হলেও মূলতঃ প্রধানমন্ত্রীই তা করেন। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন।

পদমর্যাদার দিক থেকে ঃ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে অধ্যাপক লাস্কি বলেন যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ব্রিটেনের রাজা অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তবে কিছু কিছু বিষয়ে কম ক্ষমতাসম্পন্ন। সাধারণঃ প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা উন্নততর হিসেবে পরিগণিত হন। কারণ তিনি কেবল শাসকই নহেন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও বটে। ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তাঁরা প্রেসিডেন্ট এর অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র।

জরুরি অবস্থা ঃ

প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীন। কেননা তিনি কংগ্রেসের নিকট কোনরূপ দায়ী নন এবং বিপদকালে তিনি একনায়কের মত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যাবলী ও নীতির জন্য সর্বতোভাবে পার্লামেন্ট এর নিকট দায়ী থাকেন। বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকতর দায়িত্বশীল।

দলীয় আনুগত্য বিষয়ে ঃ

পার্লামেন্টারী প্রথা ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের বিরুদ্ধে কাজ করতে অক্ষম। যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে দলের নির্দেশকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

দলের জন্যই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। কমন্স সভার অধিকাংশের সমর্থন যতদিন প্রধানমন্ত্রী লাভ করতে সক্ষম হন ততদিন তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করতে পারেন।

নির্বাচনী যোগ্যতা ঃ

জন্মসূত্রে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-কে আমেরিকার নাগরিক হতে হবে। কমপক্ষে ১৪ বৎসর আমেরিকাতে বাস করতে হবে এবং বয়সসীমা অন্ততঃ পক্ষে ৩৫ বছর হতে হবে।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এর পদ কোন শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ভোটার হবার যোগ্যতা থাকলেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন।

সারকথাঃ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উভয়েই পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন এবং তারা শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন। তথাপি পদের ক্ষমতা কার্যাবলী ও প্রভাব প্রতিপত্তির পার্থক্য সুস্পষ্ট বর্তমান । কারণ উভয়েই ভিন্ন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন -
   ক. প্রেসিডেন্ট কর্তৃক;
   খ . রাজা-রানী কর্তৃক;
   গ. স্পীকার কর্তৃক;
   ঘ. বিচারপতি কর্তৃক।

২. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত -
   ক. শাসনতন্ত্রে;
   খ. কমন্স সভায়;
   গ. প্রথাগত বিধানের উপর;
   ঘ. আদালতের রায়ের উপর।

৩. আইন সভার উপর নির্ভর করতে হয় না -
   ক. ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী;
   খ. ভারতের প্রধানমন্ত্রী;
   গ. যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি;
   ঘ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরমালাঃ ১, খ ২, গ ৩, গ

রচনামূলক প্রশ্ন
১. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সাথে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আইন সভার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

উদ্দেশ্যঃ

এ পাঠ শেষে আপনি—

◆ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের আইন সভাতেই কমিটি ব্যবস্থা বিদ্যমান। আইন সভাগুলোর কাজের ব্যাপকতা, সদস্যদের হাতে সময়ের স্বল্পতা এবং আইন সম্পর্কে সদস্যদের জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি কারণে আইন সভাগুলোর মাঝে কমিটি গঠনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আইন সভার কমিটিগুলো স্ব স্ব দেশে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে উভয় দেশের আইন সভার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। উভয় দেশের কমিটি ব্যবস্থায় তুলনামূলক আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

গঠনগত পার্থক্য ঃ

উভয় দেশের কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে গঠনগত পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্রিটিশ কমন্স সভায় কমিটিগুলোর সদস্য মনোনয়নের জন্য একটি 'মনোনয়ন কমিটি' (Committee of selection) রয়েছে। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কমিটিগুলোর সদস্য মনোনয়নের জন্য উভয় কক্ষের সরকারী ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গঠিত 'কমিটিগুলো কমিটি' (Committee of the Committees) নামে একটি উচ্চতর কমিটি রয়েছে।

দলীয় প্রভাব ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে আইন সভার কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাব বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। আইন সভার প্রতিটি কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাদের আনুপাতিক হারে কমিটিগুলোতে সদস্য প্রেরণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাব এতটা প্রাধান্য পায় না।

সদস্যদের যোগ্যতা ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি গঠনের সময় সদস্যদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়। কিন্তু, ব্রিটেনে কমিটি গঠনের সময় এ সকল বিষয়কে খুব বেশী আমলে আনা হয় না।

সীমাবদ্ধতা ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলো প্রয়োজন মনে করলে কমিটির বাইরের লোকের সাথে পরামর্শ করতে পারে। কিন্তু, ব্রিটেনে সাধারণতঃ তা করা হয় না।

কমিটি ও সদস্য সংখ্যা ঃ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কমিটির সংখ্যা অনেক বেশী তবে প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। পক্ষান্তরে, ব্রিটেনে কমিটির সংখ্যা কম হলেও প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী।

বিল প্রণয়ন ও উত্থাপন ঃ

ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রচলিত না থাকায় ক্যাবিনেটই আইনের খসড়া প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী বিলগুলো আইন সভায় উত্থাপন করেন। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রচলিত থাকায় ক্যাবিনেট সদস্যরা আইনের খসড়া প্রণয়ন কিংবা আইন সভায় বিল উত্থাপন করতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করে আইন সভার স্থায়ী কমিটিগুলো। তাই বলা যায়, বিল প্রণয়ন ও আইন সভায় বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলোর ভূমিকা ব্রিটিশ কমিটিগুলোর ভূমিকা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বিল পরিচিতি ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলোর সভাপতির পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কমিটির সভাপতি বেশী মর্যাদা ও প্রচার পেয়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলগুলো কমিটির সভাপতির নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু ব্রিটেনে কমিটিগুলোর সভাপতির নামে কোন বিল পরিচিতি লাভ করে না। এখানে কমিটির সভাপতি পুরোপুরি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলোর সভাপতির পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঃ

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ কমিটিগুলোর ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলোর তুলনায় যথেষ্ট দুর্বল। কেননা যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিলের মূলনীতিগুলো কংগ্রেসের কোন কক্ষে গৃহীত হওয়ার পূর্বে বিলটিকে কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ আইন সভায় বিলের নীতিগুলো গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তা কমিটিতে প্রেরণ কর হয় না। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলো যে কোন বিলকে বাতিল করে দিতে পারে। কিন্তু ব্রিটেনের কমিটিগুলো তা পারে না।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন সভায় কমিটিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী লবিং-এর মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়। পক্ষান্তরে, ব্রিটেনে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাই সেখানে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মন্ত্রীদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়।

সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ

ব্রিটিশ কমিটিগুলোর তুলনায় মার্কিন কমিটিগুলোর গুরুত্ব সার্বিক বিচারে অনেক বেশী; তাই কমিটির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইন সভার সদস্যদের তুলনায় মার্কিন আইন সভার সদস্যদের আগ্রহ বেশী দেখা যায়।

চূড়ান্ত ক্ষমতা ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে বিল সম্পর্কে কমিটিগুলোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ব্রিটিশ কমিটিগুলোর এমন কোন ক্ষমতা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিল প্রসঙ্গে আইন সভার দুই কক্ষের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে তা মেটানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটি (Decide Committee) নামে একটি কমিটি গঠনের বিধান আছে। কিন্তু ব্রিটেনে এ ধরণের কোন প্রথা নেই।

সারকথাঃ

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কমিটি ব্যবস্থায় উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলো ব্রিটেনের কমিটিগুলোর অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন-এর উক্তি এই ক্ষেত্রে যথার্থ -'কমন্স সভার স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য কমিটিগুলো পুরাতন ধরনের, তারা কেবল অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রদান করতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলোর অভিনবত্ব এই যে, তা আইনের প্রস্তাব উত্থাপনসহ আইন প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে'।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. আইন সভার কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাব বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় কোন দেশে?
   ক. বাংলাদেশে;
   খ. ভারতে;
   গ. ব্রিটেনে;
   ঘ. যুক্তরাষ্ট্রে।

২. কমিটি গঠনের সময় সদস্যদের দক্ষতা ও যোগ্যতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয় -
   ক. ব্রিটেনে;
   খ. যুক্তরাষ্ট্রে;
   গ. বাংলাদেশে।

৩. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে-
   ক. ফ্রান্সে;
   খ. যুক্তরাষ্ট্রে;
   গ. ব্রিটেনে।

উত্তরমালাঃ ১. ঘ ২. খ ৩. গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে বিল প্রণয়ন কিভাবে হয়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনের আইন সভার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করুন।

ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার তুলনা

পাঠ-৪

উদ্দেশ্যঃ

এই পাঠ শেষে আপনি—

◆ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারবেন।

আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতান্ত্রিক সরকারের অপরিহার্য পূর্বশর্ত রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলই তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস পায়। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন- উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দলীয় ব্যবস্থার সফল বিকাশ ঘটেছে। উভয় দেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের গঠন, প্রকৃতি, কার্যাবলী ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।

সাদৃশ্য ঃ

ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর বিরাট সংগঠন রয়েছে। সরকারী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজ নিজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য তারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হতে সচেষ্ট হয়। উভয় দেশেই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ঐতিহ্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান। ফলে উভয় দেশেই জনগণ ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও নেতৃত্বের অনুসারী এমন দু'টি দলের মধ্যে কোন একটিকে পছন্দমত ভোট দান করতে পারে। অবশ্য উভয় দেশেই ছোট-খাট অন্যান্য দলও আছে। তবে তাদের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের সংবিধানেই দলীয় ব্যবস্থার কোন উল্লেখ নাই। দলীয় ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই প্রথার (convention) ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

প্রথমতঃ

দলীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের মাত্রার দিক দিয়ে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনের দল দু'টি যেমন সুসংঘবদ্ধভাবে স্তর বিন্যস্ত, যেমন স্থানীয় দলগুলো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীন এবং দলীয় ব্যবস্থায় যেরূপ কঠোর নিয়মশৃংখলা আছে, যুক্তরাষ্ট্রের দল দু'টি সেভাবে সংগঠিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তর, যথা- জাতীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে থাকলেও রাজ্য ও স্থানীয় স্তরের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নাই। অপর পক্ষে ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রাধান্য ভোগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দল দু'টির মধ্যে কর্মসূচী সম্পর্কে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু ব্রিটেনে দু'টি দলের কর্মসূচীও আদর্শের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ

ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনায় অনেক বেশী সুশৃঙ্খল। দলীয় সদস্যগণের মধ্যে দৃঢ় শৃঙ্খলাবোধ নিশ্চিত করার মত শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের কোন দলের কেন্দ্রীয় সংগঠনেরই নাই। দলীয় সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট দলের স্থানীয় সংগঠনের উপরই নির্ভরশীল এবং সেই সংগঠন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে বা ক্ষেত্র বিশেষ জাতীয় প্রশ্নে উদাসীনও থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, ব্রিটেনে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে দলীয় শৃঙ্খলা ও সংহতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে বিজয়ী হতে হলে তাঁকে তাঁর দলের সংগঠন, কর্মসূচী ও সর্বোপরি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপর নির্ভর করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ভোট দান করতে পারেন না, কারণ তা হলে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন হারাবেন।

তৃতীয়তঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য পদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা দেখা যায়। কোন দলের সদস্য পদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করার কিংবা দলের সপক্ষে কাজ করার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ফলে খুব কমসংখ্যক সদস্যই আনুষ্ঠানিকভাবে কোন দলের সদস্য হন। অপরপক্ষে, ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য পদের দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে। দলীয় সদস্য হতে হলে কোন সদস্যকে দলের প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দান পূর্বক সদস্য পদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করতে হয়। প্রত্যেক দলীয় সদস্য সংশ্লিষ্ট দলের সপক্ষে কাজ করতে বাধ্য থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলের সদস্য ও সমর্থকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু ব্রিটেনে দলীয় সদস্য ও সমর্থকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়।

চতুর্থতঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটার নির্দলীয়, অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আবার রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও অনেকের আনুগত্য বেশ ক্ষণস্থায়ী - তারা আজ এ দলের এবং কাল ঐ দলের সমর্থক হতে দ্বিধা করে না। আর তাই মার্কিন নির্বাচকদের (voter) মোটামুটিভাবে দল-নিরপেক্ষ (Non-partisan) বলা যায় । কিন্তু, ব্রিটেনে নির্দলীয় নির্বাচক বা প্রার্থীর সন্ধান পাওয়া দুস্কর। অবশ্য সেখানে কিছু কিছু ভাসমান নির্বাচক (Floating voters) আছে, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

পঞ্চমত ঃ

ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় নেতার তুলনায় অধিকতর কর্তৃত্ব (authority) ভোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন রাষ্ট্রপতি এবং তার নির্বাচন প্রক্রিয়াও সম্পর্ণ স্বতন্ত্র। ব্রিটেনেও প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভোটদান করা সাধারণ নাগরিকের পক্ষে অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর জন্য ভোট প্রদানের একমাত্র উপায় দল তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের স্থানীয় পার্লামেন্টারী প্রার্থীর স্বপক্ষে ভোট দান করা । স্থানীয় প্রার্থীর ব্যক্তিত্বের তুলনায় দলীয় নেতার ব্যক্তিত্বই এক্ষণে ভোটারগণকে বেশী আকৃষ্ট করে - যার মাধ্যমে দলীয় নেতার কর্তৃত্বই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন রাষ্ট্রপতি।

সারকথাঃ

ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণী-ভিত্তি যথেষ্ট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে তা ঘটে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক দলই সকল শ্রেণীর ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিফলন ঘটিয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রদর্শন করে না। সেখানে দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু, ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণভাবে নির্দিষ্ট আদর্শ পোষণ ও অনুসরণ করে থাকে। সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের প্রতি ব্রিটিশ দলগুলোর সাধারণ আবেদন বিদ্যমান বিধায় তাদের শ্রেণী ভিত্তিক সমর্থনও রয়েছে। বলা হয় যে, ব্রিটেনের দল দু'টির মধ্যে মতাদর্শগত যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. সংবিধানে দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখ নেই -
   ক. জার্মানীতে;
   খ. ইতালীতে;
   গ. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে।

২. দলীয় ব্যবস্থা প্রথা (convention)-এর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে-
   ক. ভারতের;
   খ. সুইজারল্যান্ডের;
   গ. বাংলাদেশের;
   ঘ. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের।

৩. কোন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য পদের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা যায়?
   ক. যুক্তরাষ্ট্র;
   খ. চীন;
   গ. নরওয়ে।

৪. মোটামুটি দল নিরপেক্ষ বলা হয় -
   ক. রাশিয়ার নির্বাচকদের;
   খ. কিউবার নির্বাচকদের;
   গ. ব্রিটেনের নির্বাচকদের;
   ঘ. মার্কিন নির্বাচকদের।

উত্তরমালাঃ ১, গ ২, ঘ ৩, ক ৪ ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের মধ্যে সাদৃশ্যগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলর বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন